জীবনরসিক কবি বিজয় গুপ্ত ও তাঁর পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল

ড.মানচিত্র পাল, অতিথি সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, আসাম

মঙ্গলকাব্য তথা মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে অন্যতম বিজয় গুপ্ত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমে ঘাগর নদী এবং পূর্বে গণ্ডেরশ্বরের মাঝে অবস্থিত ফুল্লশ্রী গ্রামে।[১] তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং কাণা হরিদত্ত ও নারায়ণ দেবের পরবর্তীকালের কবি। সেইসঙ্গে, সনতারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি।[২] তাঁর কাব্যের নাম মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ। কাব্যটির মোট পালা ২১ টি। গান ৩০১ টি। মিত্রাক্ষর, পয়ার ও ত্রিপদী ৫৫৮২ টি।[৩] যদিও এগুলি সব বিজয় গুপ্তের রচনা নয় বলে জানিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য বিশ্বাস। তাঁর মতে, ১৫ এবং ২০তম পালা দুটি সবচেয়ে বড়। এবং এখানে বহু কবি, গায়েন ও লিপিকরদের দ্বারা প্রক্ষেপও হয়েছে বেশি।[৪] তবে, কাব্যটির সংগ্রহ সম্পর্কে সুকুমার সেনের কথা মতে জানা যায় যে, কাব্যটি সংগ্রহ করেছিলেন প্যারীমোহন দাশগুপ্ত। ছাপা হয়েছিল ১৩০৬ সালে বরিশাল আদর্শযন্ত্রে নন্দকুমার দাসের দ্বারা। প্রকাশ করেছিলেন রামচরণ শিরোরত্ন।[৫] প্রকাশক মুখবন্ধে যে তথ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিজয় গুপ্তের কাব্যের প্রসঙ্গে যে তথ্য উঠে এসেছে তা সুকুমার সেনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"অনেক দিন যাবৎ বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৈলা গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ প্যারীমোহন দাসগুপ্ত অতীব যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে পূর্বঙ্গের একমাত্র প্রাচীন কবি মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রণীত মনসামঙ্গল নামক মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কখনই মুদ্রিত হয় নাই। ..."[৬]

বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। রচনাকাল সম্পর্কে পাওয়া তিনটি শ্লোকই এই বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, শ্লোক তিনটিতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কালের কথা বলা হয়েছে। যেমন[৭]-

ক। ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।

সনাতন হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।

খ। ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।

সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।

গ। ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।

উক্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটিতে যে সময়ের পরিচয় মেলে তা হল, ১৪০০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয়তে ১৪০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৪, তৃতীয়টিতে ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪। এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকটি বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই সময়টিকে বড় বড় পন্ডিতেরা মেনে নেননি। শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্যের মতে জানা যায়, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রাচীন গ্রন্থ হওয়ায় এর সময় নির্ধারণ করা কঠিন। তবে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ১৪০৭ থেকে ১৪১৬ এর মধ্যে রচিত হয়।[৮] এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন-

“ঋতু শূন্য বেদ শশী” বলিতে ১৪০৬ অর্থাৎ ১৪৮৪ অব্দে। হোসেন-শাহার সিংহাসন লাভ করিতে তখনও বছর দশক দেরি। সুতরাং এ তারিখ অগ্রাহ্য।”[৯]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

“বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয়ে সুলতান হুসেন শাহের নামোল্লেখ থাকায় তাঁহার রচনাকাল-নির্দেশক ইঙ্গিতের যথাযথ ব্যাখ্যাকে ১৪৯৪ খৃ. অঃ-র সহিত সমার্থবাচক ধরা সুসঙ্গত। ...”[১০]

ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, বিজয় গুপ্তের কাব্যে রচনাকাল জ্ঞাপক যে পয়ারটি তাঁর কাব্যে পাওয়া গেছে তাতে পরবর্তী ছত্রের সাথে পূর্ববর্তী ছত্রের মিল না থাকায়, প্রথম ছত্রের সংখ্যা নির্দেশে লিপিগত প্রমাদ ঘটেছে। এবং প্রথম ছত্রটির যে পাঠান্তর অন্যগ্রন্থে পাওয়া গেছে অর্থাৎ ‘ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক’ ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রি। এই সময়টি হোসেন শাহের রাজত্বকালের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এই কালটি বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ভূদেব চৌধুরী।[১১] আশুতোষ ভট্টাচার্যও একই কথা বলেছেন। তিনি বিজয় গুপ্তের কাব্যে ব্যবহৃত ১৪০৬

অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রি. এই সময়টির সাথে একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অমিল রয়েছে বলে জানিয়েছেন। তথ্যটি হল গৌড়ের হুসেন শাহের উল্লেখ। হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রি. থেকে ১৫১৮খ্রি. পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন। কাজেই কবির কালজ্ঞাপক শ্লোকটি ভুল রয়েছে।[১২] তিনি আরো বলেছেন যে, মনসা-মঙ্গলের কালনির্দেশক উক্ত 'ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক' পদটির পরিবর্তে 'ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত' কিংবা 'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক' এই প্রকার আরও দুটি পাঠ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথম পদটি থেকে ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খ্রি. পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য ইহাও হুসেন শাহের সময়ের অনুকূল নহে। শেষোক্ত পদটি হইতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সময় হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। এই সময়টি বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনার কাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অতএব বিজয় গুপ্তের কাব্যে রচনা কাল সামান্য ভুল রয়েছে। শূন্য স্থলে শশী হবে'। এতে বোঝা যায় বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রি. দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।"[১৩]

বিজয়গুপ্তের কাব্যের গঠন

১। মঙ্গলকাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য করুণ রসের ব্যবহার। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে করুণ রসের পরিচয় মেলে। তবে তা সীমিত আকারে। লৌহ বাসরে লখিন্দরের মৃত্যুর পর মাতা সনকার বেদনাময় অবস্থার বর্ণনায় করুণ রসের পরিচয় মেলে এভাবে-

"কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।

দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়।।

দুই হস্তে ধরি রাণী লাখাই নিল কোলে।

চুম্বন করিল রাণী বদন-কমলে।।"[১৪]

২। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম লক্ষণ ছন্দের ব্যবহার। বিজয় গুপ্তের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত বাংলা মঙ্গল কাব্যে পয়ার ও লাচারীর ব্যবহার অধিক ছিল। কিন্তু বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে গতানুগতিক ছন্দের

ব্যবহার না করে ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনলেন, এবং ব্যবহার করলেন তাঁর কাব্যে আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দ। যেমন-

"প্রেতের সনে/ শশ্মানে থাকে/ মাথায় ধরে/ নারী।

সবে বলে/ পাগল পাগল/ কত সইতে/ পারি।।

আগুন লাগুক/ কান্ধের ঝুলি/ ত্রিশূল লউক/ চোরে।

গলার সাপ/ গরুড় খাউক/ যেমন ভাগুল/ মোরে।।"[১৫]

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বিজয় গুপ্তের গভীর জ্ঞান ছিল । মনসামঙ্গল কাব্যের দেব খণ্ডের অন্তর্গত মনসাদেবীর উৎপত্তির পালা অংশে যে তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, তিনি সংস্কৃত পোরাণিক সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে, এ বিষয়ে তিনি কাণা হরিদত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য।[১৬]

৪। অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিজয় গুপ্ত নিজস্ব মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে, ব্যজস্তুতি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ব্যজস্তুতি অলঙ্কারের পথপ্রদর্শক ছিলেন বিজয় গুপ্ত। পরবর্তীকালে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র রায় তাঁদের কাব্যে ব্যজস্তুতি অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলেন।[১৭]

৫। উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিজয় গুপ্ত নতুনত্ব এনেছেন। সংস্কৃত পুরাণের পরিবেশে কাব্য রচনা শুরু করেও সংস্কৃত উপমার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের চোখে দেখা বা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন-

"জনম দুঃখিনী আমি? দুঃখে গেল কাল।

যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।

...

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।

নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল।।”[১৮]

৬। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্ত বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে, সনকার চরিত্রটির ক্ষেত্রে প্রমাণ মেলে। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

“মনসা মঙ্গল কবিদিগের রচনার মধ্যে বিজয় গুপ্তের সনকা চরিত্রই সর্বোকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। চাঁদসদাগর-বেহুলা অনেক সময় ধূলি-মাটির ঊর্ধে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু সনকার প্রতিটি পদক্ষেপ ধরণীর ধূলি-মাটির উপর অঙ্কিত হইয়াছের।”[১৯] ,

৭। বিজয় গুপ্তের কাব্যের বিশেষ গুণ দেবতার চরিত্রের চেয়ে মানব চরিত্রের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ। ফলে, তারঁ কাব্যে দেখা যায়, দেবী মনসার হৃদয়হীনতার দিকটি প্রকাশ পেতে-

“পাপিষ্ঠ মনসা পাষাণ তার হিয়া।”[২০]

এটা তিনি করেছেন সচেতনভাবে। কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবের মঙ্গল গান করা।

৮। বিজয় গুপ্তের কাব্যের কালজ্ঞাপক শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। যা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্লোকটি হল-

“ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।

সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।”[২১]

৯। বিজয় গুপ্তের কাব্যে আধুনিক কালের সংযোজন রয়েছে। এর পরিচয় মেলে তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত উপকরণে-

“বাঁকে বাঁকে ডিঙ্গা পবনগতি যায়

শালবনের রাজ্য গিয়া ততক্ষণে পায়।”[২২]

সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় চরণে ব্যবহৃত ‘শালবনের’ শব্দটি ছিল আসলে ‘শালবান’ বা শালবাহনের রাজ্য। কিন্তু ‘শালবান’ শব্দটি অপরিচিত হওয়ায় তার পরিবর্তে শব্দটি হয়ে দাঁড়াল শালবন। তখন শালবনের বর্ণনা দেওয়া হল এভাবে-

“অতিবড় শালবন জুড়িছে পাতে পাতে

মনুষ্যের গতি নাই সাত দিবসের পথে।”[২৩]

১০। মঙ্গলকাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বন্দনা অংশ। বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। তবে, এ বন্দনা হয় একেবারে অসাম্প্রদায়িক। বিজয় গুপ্তের কাব্যের দেবখণ্ডের অন্তর্গত মনসার জন্ম পালা অংশে লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈদিক বিভিন্ন দেবদেবীদের বন্দনার পরিচয় মেলে-

“বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যন্ত্রে দিয়া ঘা। স্বর্গ ছাড়ি ওলাও গো জগত গোরী মা।।

জরৎকারু মুনি বন্দম মনি পুরন্দর। বলদ বাহনে বন্দম দেব মহেশ্বর।।

আস্তিক নামে মুনি বন্দম পদ্মার তনয়। ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দম দেবী মহামায়া।।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বন্দম শচী যার জায়া। বারাহী চামুণ্ডা বন্দম দেবী মহামায়া।। ...”[২৪]

১১। বিজয় গুপ্তের কাব্যে পুষ্পবাড়ির বর্ণনা মনোমুগ্ধকর এবং দর্শকমাত্রকেই তা আকর্ষিত করেছে। নানা ফুলের সমাবেশ এবং উপস্থাপন শিবের মত পাঠদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কাব্যে যে ফুলের বর্ণনা কবি করেছেন তা হল-

“চাপা নাগেশ্বর জাতি লবঙ্গ মালতি যূথি কেওয়া কস্তুরী কুরুবক।

টগর মাধবী লতা অশোক অপরাজিতা করবী যে বকুল তিলক।।

গোলাপ মল্লিকা ধাই কূটজ কাঞ্চন জাই কস্তুরী ধুতুরা শতবর্গ।

তুলসীর ফুল যত তাহা বা কহিব কত জবা পুষ্প দিতে সূর্য অর্ঘ্য।।”[২৫]

...

তথ্যসূত্র

১। অচিন্ত্য বিশ্বাস ভূমিকা ও সম্পাদনা-কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৯, পৃ-৯৫

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মে ২০১৫, পৃ-২৬৪

৩। অচিন্ত্য বিশ্বাস ভূমিকা ও সম্পাদনা-কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৯, পৃ-২০

৪। তদেব, ২০

৫। সুকুমার সেন-বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ-১৮৮

৬। তদেব,পৃ-১৮৮

৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মে ২০১৫, পৃ-২৬৫

৮। শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত –কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪২, পৃ- ভূমিকা

৯। সুকুমার সেন-বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ-১৮৯

১০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ-৭১

১১। শ্রীভূদেব চৌধুরী-বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়, দে'জ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮ ডিসেম্বর, পৃ-১৯০-১৯১

১২। আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মে ২০১৫, পৃ-২৬৪

১৩। তদেব, পৃ-২৬৫

১৪। তদেব, পৃ-২৬৬

১৫। তদেব, পৃ-২৬৭

১৬। তদেব, পৃ-২৬৭

১৭।তদেব, পৃ-২৬৭

১৮। তদেব, পৃ-২৬৮

১৯।তদেব, পৃ-২৭১

২০। তদেব, পৃ- ২৭২

২১। তদেব, পৃ-২৬৪

২২। সুকুমার সেন-বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ-১৯১

২৩। তদেব, পৃ-১৯১

২৪। অচিন্ত্য বিশ্বাস ভুমিকা ও সম্পাদনা-কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৯, পৃ-৯৩

২৫। তদেব, পৃ-৯৮

গ্রন্থপঞ্জি

১। অচিন্ত্য বিশ্বাস ভূমিকা ও সম্পাদনা-কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৯, পৃ-৯৫

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মে ২০১৫

৩। সুকুমার সেন-বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ অক্টোবর ২০০৯

৪। শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত –কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্ক্রণ বৈশাখ ১৩৪২

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৯

৬। শ্রীভূদেব চৌধুরী-বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়, দে'জ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮ ডিসেম্বর

৭। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত-ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৯

৮। দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নবম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৮৬

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-২০১৬

১০। ক্ষেত্র গুপ্ত-বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ আগষ্ট ২০১২